পঞ্চম অধ্যায়

উনিশ শতকের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যে স্বদেশ ভাবনা

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য এক নতুন সংযোজন। এই ধারার কবি হিসাবে বিখ্যাত নাম — রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। এছাড়া আরো অনেকে এই শ্রেণীর কাব্য চর্চা করেছিলেন। যথা;— দীননাথ ধর (কংস বিনাশ-১৮৬১), মহেন্দ্রচন্দ্র শর্মা (নিবাতকবচ বধ-১৮৬৯), ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (পাণ্ডব চরিতকাব্য-১৮৭৭), বলদেব পালিত (কর্ণার্জুন কাব্য ১৮৭৫), বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (শক্তিসম্ভব কাব্য-১৮৭০), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দানবদলন কাব্য ১৮৭৩), গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (ভার্গব বিজয়-১২৮৪ বঙ্গাব্দ), হরগোবিন্দ লস্করচৌধুরী (রাবণবধ ১৩০০ বঙ্গাব্দ), যোগীন্দ্রনাথ বসু (পৃথ্বীরাজ-১৩২২ বঙ্গাব্দ ও শিবাজী-১৩২৫ বঙ্গাব্দ) ।

বাংলা সাহিত্যের এই প্রকরণটির একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় , তা হল এই ধারার কাব্যচর্চা অর্ধশত বর্ষের বেশী স্থায়ী হয় নি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে যার সূচনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বারা যার সার্থক সমৃদ্ধি, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্রের পরই সেই কাব্যপ্রবাহের পরিণতি সূচিত হয়ে গেছে। এরপর আর কোন কবি-সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি । এমন কি মহাপ্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রকরণে কৃতিত্ব দেখালেও আখ্যানকাব্য বা সাহিত্যিক মহাকাব্য লেখেন নি। তাহলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি কি সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না? আসলে উনিশ শতকের পরে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচনার পিছনে প্রতিভা কোন সমস্যা নয়, সমস্যা ছিল যুগরুচি । বলা যায়, বাংলা কাব্যধারা অন্য পথে প্রবাহিত হওয়ায় সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচিত হয়নি। বিষয়টি তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য' গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

> "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতি-চরিত্র গঠনের যে সর্ব্বব্যাপী প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, জড়তা ও সংস্কারের প্রভাবমুক্ত যে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ দেশের আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল—সে আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন গীতিকবিতা হইতে পারে না; গুরুবস্তুভার-বহনক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। গীতিকবিতা সেই যুগেরই সৃষ্টি যে যুগে জাতীয় জীবন শান্ত ও সমাহিত। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিকবিতা রচিত হইলেও এই গীতিকবিতার জন্য সে যুগের জনচিত্ত

যেন প্রস্তুত ছিল না —এই শ্রেণীর কবিতার রস-আত্মা সে যুগের রসিকের কাছে উন্মোচিত হয় নাই। বিহারীলাল এবং তাঁহার অনুগামী কবিগোষ্ঠীর সহিত যেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়া দিয়াছেন।...পরিশেষে দেখা গিয়াছে বিহারীলালের কাব্যধারাই জয়ী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার দৃষ্টান্ত।"(১)

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই শ্রেণীর কাব্যধারার জন্ম কি বিশেষ কোন প্রয়োজনে ? আমরা লক্ষ করব, এই শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টির পিছনে দুটি প্রেরণা কাজ করেছে। প্রথমতঃ সমৃদ্ধ শিল্প হিসাবে বাংলা কাব্যকে প্রতিষ্ঠা করা ও দ্বিতীয়তঃ জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির প্রয়াস ।

বলা যায় সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত । এই প্রসঙ্গে 'আধুনিক বাংলা কাব্য'-এ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন;—

"১৮৩০ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত এ পর্ব্বের বাংলা কাব্যকে জাতীয় আন্দোলনের কাব্য বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি এই যুগের কাব্যের প্রধান লক্ষ্য নয়। জাতীয় আদর্শের প্রচারের গুরুদায়িত্ব এই যুগের কাব্যের লক্ষ্যকে ভিন্নমুখী করিয়াছে। কাব্যের গতি সৌন্দর্য্যলোকের দিকে; কিন্তু এ যুগে গুরুবস্তুভার ঝুলাইয়া দিয়া কাব্যকে বাস্তব জগতের দিকে টানিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮০০ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের রসের ভাণ্ডারে যেন তালাচাবি আটকাইয়া কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডারটি উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল ঈশ্বর গুপ্ত কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ রসের উৎস-মুখ অনাবৃতকরিয়াছিলেন, নতুবা গদ্যানুশীলন, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নূতনাদর্শের নাটক রচনার ঝোঁকে কাব্যের রসধারাটির উপর সকলে যেন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর রঙ্গলাল যখন সেই কাব্যধারার দিকে আবার জনচিত্তকে আকর্ষণ করিলেন, তখন এই কাব্যধারা জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনের বাহন হিসাবেই গৃহীত হইয়াছিল এবং এই পরিচয়-ই এই যুগের কাব্যের বিশিষ্ট পরিচয়।" (২)

উক্ত বক্তব্যে আলোচ্য সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যের উদ্দেশ্যমূলকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও শিল্পসমৃদ্ধ কাব্য সৃষ্টি করবেন বলে মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেছিলেন । তবুও যেন তাঁর কাব্যটি উদ্দেশ্যমূলকতার গন্ধযুক্ত । 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ কবি লিখেছেন;—

" . . .গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি " (৩)

বাঙালী 'মেঘনাদবধকাব্য' এর রসামৃত পাঠ করে যাতে আনন্দ পান, কবির সেটাই লক্ষ্য ছিল। সে জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে কবি যথাসম্ভব শিল্প সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেন। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়

'মেঘনাদবধ কাব্য' তথা অন্যান্য সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যান কাব্যগুলি রচিত হয়নি । বলা যায়, এইজাতীয় কাব্য রচনার পিছনে রয়েছে দেশানুরাগ । তা বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যই হোক আর জাতির আত্মচেতনার বিকাশ ঘটানোর বিশেষ উদ্দেশ্যই হোক । এই উভয় প্রকার উদ্দেশ্যই দেশানুরাগের অন্তর্ভুক্ত । কেননা বাঙালী কবির নিকট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য । মাতৃভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান একজন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তির পরম আদরণীয় বিষয় । আর জাতির আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটানোর প্রসঙ্গ তো সরাসরি স্বদেশ বৎসলতার কথাকেই মনে করিয়ে দেয় । কেননা, জাতির আত্মচেতনার বিকাশ ঘটলে জাতিরই মানব সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। উনিশ শতকে আখ্যানকাব্য বা সাহিত্যিক মহাকাব্য ধারার উদ্ভবের মূলে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। যা কখনো মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধির মধ্যে আবার কখনো তা মানব সম্পদ সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ ।

ধারাবাহিকতার বিচারে প্রথমে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্যের আলোচনা হবে। তারপর মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের আখ্যানকাব্য বা সাহিত্যিক মহাকাব্য ক্রমান্বয়ে আলোচিত হবে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২৩৪-১২৯৪ বঙ্গাব্দ) একটি অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। তিনি জাতি গঠনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যবোধেরও গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন- করণের শিক্ষা-প্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংশুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানবিদ্যা স্বভাবতঃ কঠিন এবং ঔৎসুক্যবিহীন, অতএব চিত্তাকিরণ-করণক ভাবকুসুম-প্রফুল্লকারী পরম-গৌরবভাজন কলা-কলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা প্রিয়ঙ্কর হয় না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদনার্থ যেরূপ বিজ্ঞান — বিদ্যার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ সম্পাদনার্থ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলা আবশ্যকতা।" (৪)

এদেশে এই দু'টি বিষয়কে যুগোচিত করার জন্য তিনি বলেছিলেন;— "উভয়বিধ পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন অতি কর্তব্য।"(৫) এখানে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানের প্রতি প্রয়োজনীয় আনুগত্য ও সুগভীর নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু কাব্য সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতির চেতনায় স্বদেশ ভাবনার স্পন্দন এনে দিতে সফল হয়েছিলেন। আগুনের সঙ্গে উত্তাপ যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তেমনি তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে জাতির আত্মসচেতনতার ভাবনা নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত ।

বাংলা সাহিত্যের অনান্য প্রকরণেও কবির স্বদেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে পরিচিত হলেও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণে তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। এই সব একাধিক প্রকরণেও জাতির চেতনা বিকাশের ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়। আখ্যানকাব্য ছাড়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল;—'কলিকাতা কল্পলতা', (১৩৬৬, গল্পভারতী), 'বঙ্গ বিদ্যার আদ্যবিবরণ' (১২৫৬, এডুকেশন গেজেট), 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২ বেথুন সভায় পঠিত), 'উৎকল বর্ণন' (১৮৬৩, রহস্য সন্দর্ভ), 'কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্তবাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা' (১৮৬৬, রহস্য সন্দর্ভ), 'দীননাথ দাস' (১৮৬৪), 'উপেন্দ্রভঞ্জ' (১৮৬৪, রহস্য সন্দর্ভ), 'শরীর সাধনী বিদ্যা শিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন' (১৮৬০), 'ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা' (১৮৬৯) প্রভৃতি।

এছাড়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে অনুবাদ সাহিত্য রচনাতে হাত বাড়িয়েছিলেন। অনুবাদ সাহিত্য চর্চার পিছনে বিশুদ্ধ সাহিত্য রস আস্বাদন করার প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়া প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করার পরোক্ষ কারণও ছিল । এবিষয়ে কবির অভিমত ছিল এরকম;—

> "আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি পরিহারপূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা করণে স্বদেশহিতৈষীমাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণকরণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর, বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্য-কলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে।" (৬)

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশবাসীকে ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য 'কুমার-সম্ভব' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ), 'মেঘদূত' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), 'ঋতুসংহার' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), 'নীতিকুসুমাঞ্জলী' (১২৮২ বঙ্গাব্দ), বাংলায় অনুবাদ করেন। রঙ্গলালের সাহিত্য চর্চার দৃষ্টান্ত হিসাবে আরো উল্লেখ করার মতো 'ভেকমুষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮) এবং গান, ছন্দ, অলঙ্কার বিষয়ে বিবিধ রচনা।

এবার আমরা রঙ্গলালের আখ্যানকাব্যে বাঙালী পাঠকের আত্মসচেতনা বিকাশের আলোচনা করব । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আত্মসচেতন স্বদেশ প্রেমিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । কাব্যপ্রেমিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশীয় বাংলা কাব্যের নিন্দাবাদ শুনলে গভীরভাবে মর্মাহত হতেন । তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের পদমর্যাদা দানের জন্য কাব্য রচনা করতে কলম ধরেন । তাঁর কাব্যচর্চার সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্বদেশীয় সাহিত্যপ্রীতি ও দেশানুপ্রীতি। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর 'ভূমিকায়' তার উল্লেখ আছে। সেসময় কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী, সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখ স্বদেশ হিতৈষী 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এর বক্তব্যে আনন্দিত হন; এবং তাঁরা প্রাবন্ধিককে বিশুদ্ধ কাব্য রচনার জন্য উৎসাহ দেন। এবিষয়ে কবি লিখেছেন;—

"এই অভিনয় কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। ...আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, ...বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা — "আধুনিক যুবাজনে স্বদেশীয় কবিগণে,

ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।

বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা সুধার-সদ্ম,

এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে।।"

... স্বদেশহিত তৎপর সুনির্ম্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে সত্তাবৎপাঠে এতদ্দেশীয় বালক, বৃদ্ধ, বণিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় লোকদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিতহইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন।" (৭)

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিগণের অনুপ্রেরণায় এবং স্বদেশীয় কাব্যের উৎকর্ষতা সৃষ্টির একান্ত নিজস্ব আন্তরিক উদ্যোমে প্রভাবিত হয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) প্রভৃতি আখ্যানকাব্য রচনা করেন। অতএব বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন প্রকরণ আখ্যানকাব্যের সৃষ্টির আড়ালে স্বদেশ ভাবনা কাজ করেছিল, একথা বলা যায় ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে কলম ধরেন নি। তিনি কাব্যের বক্তব্যে কৌশলে পরাধীনতার গ্লানির অনুভূতি এনে পাঠককে আত্মসচেতন করার চেষ্টা করেন। সেজন্য কাব্যের গঠন পরিকল্পনাতে রাজরোষ থেকে মুক্তির আশায় রাজদ্রোহী ভাবনাগুলি তিনি সরাসরি বলেন নি। কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে দেখব, কবি রঙ্গলাল কাব্যের রাজদ্রোহী ভাবনাগুলি কৌশলে কাব্যের কথক, শ্রোতা ও চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। কবি বিশ্বাস করেন, কাব্য ঘুমন্ত জাতিকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে। কাব্য মানবিক মূল্যবোধ গুলিকে আরো সতেজ করতে পারে । অর্থাৎ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য সৃষ্টির দ্বারা অন্তরের গভীর দেশপ্রেম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একটি মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ পাঠক শ্রেণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় রঙ্গলাল তাঁর লক্ষ্যের কথা বলেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চার উদ্দেশ্য গুলির তালিকা সংক্ষেপে এইরকম;—

১। বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্যরচনা করে বাংলা কাব্যকে যথার্থ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা,

২। পরাধীন জাতির মনে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলা,

৩। কাব্যের দ্বারা পাঠকের মনে মানবিক অনুভূতিগুলিকে আরো সতেজ করা,

৪। অশ্লীল কাব্যপ্রীতির পরিবর্তে প্রকৃত কাব্যরস আস্বাদনের জন্য পাঠককে অনুপ্রাণিত করা,

এইসব উদ্দেশ্যগুলি কবি মনের বিশুদ্ধস্বদেশ প্রেম থেকে উৎসারিত বললে অযৌক্তিক মন্তব্য করা হবে না। আমরা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্যগুলি আলোচনা করে কবি মনের ভাবনাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। কবি-মনের স্বদেশ চেতনার সার্থক সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। কাব্যের উৎস থেকে বিষয় পর্যন্ত স্বদেশ ভাবনা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেসময় বাংলা ভাষায় আধুনিক মনের উপযোগী কাব্য সৃষ্টির জন্যই যেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এর অবতারণা। সেজন্য বাংলা কাব্যের চিরাচরিত জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্য রচনার জন্য কবির সক্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য পড়লে পাঠকের মানবিক অনুভূতি সতেজতা প্রাপ্ত হয়। যে মানবিক অনুভূতি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে সাহায্য করে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন, এদেশের পুরাণগুলি অলৌকিকতায় পূর্ণ কিন্তু রাজপুতদের ইতিহাস বীর-করুণরসে পরিপূর্ণ। এদেশের মানুষ স্বাধীনতাকে যে স্বর্গসুখ মনে করত। আত্মসচেতন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি রাজপুত জাতির ইতিহাসে দেখতে পেয়েছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে যাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বাধীনতা কি তা ভুলে গিয়েছিলেন, 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে কৌশলে তাঁদের আত্মচেতনা ফেরানোর চেষ্টা দেখা যায়। বিধর্মী সম্রাট আলাউদ্দিনের মেবারের রূপবতী রাণী পদ্মিনীর প্রতি কামানলের আকর্ষণ রাজা ভীমসিংহের করুণ পরিণতি ডেকে আনে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এর করুণ কাহিনী পাঠকের অন্তরে রাজপুত জাতি তথা স্বজাতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগিয়ে জাতির দুর্দশা মোচনের জন্য সহানুভূতি আদায় করতে যথেষ্ট সহায়ক। কবি কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন;—" স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস, অবলম্বনপুর্ব্বক রচিত করিলাম।" (৮)

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে ভ্রমণ পিপাসু এক পর্যটকের সঙ্গে দেশীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞ এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণ, ভ্রমণ পিপাসু পর্যটককে পদ্মিনীর কাহিনী শোনায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি ব্রাহ্মণের পদ্মিনীর কাহিনী শোনানোর ছলে রচিত হয়েছে। কাব্যটিতে সমকালের পরাধীন ভারতের পরাধীনতার

মর্মজ্বালা পরোক্ষে প্রকাশ পেয়েছে । কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যের বক্তব্য প্রকাশে কৌশল অবলম্বন করেছেন । কবি এখানে কৌতূহলী পর্যটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রাচীন স্বাধীন ভারতের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন;—

" মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন;
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন। "(৯)

—পরক্ষণেই নিঃস্ব পরাধীন ভারতের কথা স্মরণ করে বলেন;—

"এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী ।।" (১০)

মধ্যযুগের বাদশাদের ধর্মান্ধতায় ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের দুর্ভোগের চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে—

"সয়তানি বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ।
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব রে চূর্ণ।।" (১১)

—এটি হল রাণা ভীমসিংহের প্রতি সম্রাট আলাউদ্দিনের বক্তব্য।

'পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ' নামক কাব্যাংশে জাতির সম্মান রক্ষায়-জীবন তুচ্ছ-এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে;— "কুল-ধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায় ।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?" (১২)

ভারতের জাতীয় সংহতির যথেষ্ট অভাব কবিকে আহত করেছিল। এই অনৈক্যের বিষয়টি 'বাদশাহের সমর- বিজয়' নামক কাব্যাংশে প্রকাশিত হয়েছে;—

"একতায় হিন্দু-রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ ।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন ?" (১৩)

'ক্ষত্রিয় দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য' নামক কাব্যাংশে কবি ভীমসিংহের মুখ দিয়ে স্বাধীনতার প্রসঙ্গে বলেন;—

" স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে ,
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে ,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে ,
স্বর্গ-সুখ তায়! (১৪)

— এই কাব্যাংশ সমকালের আত্মচেতনাপ্রাপ্ত বাঙালীকে পরাধীনতার জন্য গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলবে— সেকথা বলাই বাহুল্য । কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চরম নৈরাশ্যবাদীর মতো নিরাশার মধ্যে কাব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করেন নি । কাব্যের শেষে তিনি শুনিয়েছেন,— ভারতের চরম দুর্ভাগ্যের রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে । সামনেই সুদিন আসার প্রবল সম্ভাবনা, তাই ভারতবাসীকে জাগতে হবে । কারণ উদার ইংরেজদের কৃপায় ভারতবাসী উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোকের অধিকারী হয়েছে, – এটা কবির কাছে মহৎ পাওনা বলেই বিবেচিত । তিনি বলেন;—

"ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর ,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরেজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ।।" (১৫)

কাব্যের শেষে কবি আত্মবিস্মৃত স্বজাতিকে জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য উৎসাহ দেন । কেননা, জাতীয় সম্মান রক্ষার দিন এখন আসন্ন প্রায় ।

কর্ম্মদেবী (১৮৬২) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় আখ্যান কাব্য 'কর্ম্মদেবী'। এই কাব্যের কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেন রাজস্থানের ইতিহাস থেকে। বাংলায় সমৃদ্ধ কাব্য সৃষ্টি ও জাতির আত্মজাগরণ ঘটানোর মতো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । সে বিষয়ে সফল হওয়ায় কবি আনন্দিত। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কবি আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 'কর্ম্মদেবী' কাব্যের প্রণয়ন করেন। 'কর্ম্মদেবী' কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি পদ্মিনী - প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয়-মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দর দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে;" (১৬)

তিনি বাংলা কাব্যের আরো উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বলেন;— "সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎকবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য।" (১৭) মধুসূদনের পূর্বে বাংলা কাব্য সম্বন্ধে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত ভাবনা যথেষ্ট মূল্যবান। এজাতীয় সুচিন্তিত মতামতের জন্য রঙ্গ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের চিন্তানায়ক বলে দাবী করা যায় ।

'কর্ম্মদেবী' কাব্যটি ব্রাহ্মণ কথক ও কৌতূহলী শ্রোতার কথোপকথনের দ্বারা রচিত । কাব্যটির মূল

আখ্যান বীরশ্রেষ্ঠ যুবরাজ সাধুর সঙ্গে রাজকন্যার কর্ম্মদেবীর প্রণয় কাহিনী । 'কর্ম্মদেবী' কাব্যে কবি বিদেশী বণিকদের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্বদেশবাসীর মনে স্বাজাত্যপ্রীতির উদ্বোধন করতে ইন্ধন যুগিয়েছেন ।

'কর্ম্মদেবী'কাব্যে প্রাচীন ভারতের গৌরবের নানা বিষয় ও সমকালের ভারতবর্ষের দুর্দশার লজ্জাজনক নানা চিত্র বর্ণনা কবির স্বদেশপ্রেম বিষয়ক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। যেমন —

" হায় কোথা সেই দিন , ভেবে হয় তনু ক্ষীণ ,
এ যে কাল পড়্যেছে বিষম ।

— — —

কবে পুনঃ বীর-রসে , জগৎ ভরিবে যশে ,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ ?" (১৮)

এই কাব্যের প্রথম সর্গে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য করতে না দেওয়ায় যে মানসিকতা নায়ক সাধুর মধ্যে প্রকাশিত, তা যেন উনিশ শতকের আত্মসচেতন অনেক শিক্ষিত বাঙালীরই মনের কথা। কেননা, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সচেতন বাঙালীরা বুঝতে পেরেছিলেন, মাতৃভূমি দীর্ঘদিন ধরে বহু বিদেশী বণিকের দ্বারা শোষিত, লজ্জিত ও পরাজিত। তাই যুবরাজ সাধু সমস্ত বিদেশী বণিকদের ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করেন। বণিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন;—

" হাজার মঙ্গলাব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি।।
এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেক প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে।।" (১৯)

সাধু বলেন — মাতৃভূমি ভারতবর্ষ নানা ধন-ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, বিদেশীদের এমন কিছু নেই — যা ভারতবর্ষকে দিতে পারে। কবির ভাষায়;—

"ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে ।"(২০)

কিংবা,

"কি ছার বাণিজ্য-দ্রব্য এ দেশে এনেছ ?"(২১)

—পরিশেষে পরবর্তীকালের স্বদেশী ভাবধারায় বিশ্বাসী চরিত্রের মত কাব্যের নায়ক সাধু বলেন;—

"অন্য দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই।।"(২২)

—এবং বিদেশী বণিকদের তাড়িয়ে দিয়ে বলেন —

"ধন আশে পুনঃ আর এস না এ দেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে।।" (২৩)

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ের কথা মনে রেখেও এই সব বক্তব্য পাঠ করার পর বলতে হয়, 'কর্ম্মদেবী' কাব্যটি কবির স্বদেশ ভাবনারই কাব্যিক রূপ।

শূরসুন্দরী (১৮৬৮) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত তৃতীয় আখ্যান কাব্য 'শূরসুন্দরী'। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'কর্ম্মদেবী' কাব্য দু'টির দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা ও কাব্যের আবেদনে স্বজাত্য বোধ জাগিয়ে তোলার সাফল্য কবিকে 'শূরসুন্দরী' কাব্য রচনায় উৎসাহিত করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাব্য 'শূরসুন্দরী' রচনা কার্যে সফল হওয়ার জন্য কাব্যের 'মঙ্গলাচরণ' নামক অংশে কবি কবিতাশক্তির প্রতি তথা কাব্যদেবীর প্রতি বন্দনা করেন। কবি কাব্যদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন;—

"করিয়াছ মম প্রতি কৃপা বারদ্বয়।
এবারেও যেন মম লজ্জারক্ষা হয়।।" (২৪)

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'বিশুদ্ধ প্রণালী' তে কাব্য রচনা করে ও কাব্যের আবেদনে স্বদেশ ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সফল হয়েছেন। কবি কাব্যদেবীর নিকট প্রার্থনা করেন, ওই বিশেষ উদ্দেশ্যে যেন 'শূরসুন্দরী'কাব্যও সফল হয়; নইলে তাঁর লজ্জার পরিসীমা থাকবে না। লজ্জা রক্ষা করার জন্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র শূরসুন্দরী, রাজস্থানের এক বীরাঙ্গনা। আকবর বাদশাহের নোংরা রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়ে 'শূরসুন্দরী' কিভাবে তার সতীত্ব রক্ষা করল ও স্বজাতীয় নারীর প্রতি বাদশাহের মানবিক মর্যাদা প্রদানের প্রতিজ্ঞাপত্র আদায় করল — এই বিশেষ কাহিনী এখানে চিত্রিত হয়েছে। বাদশাহ আকবর রাজপুত রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, এই প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা শূরসুন্দরী আদায় করেছেন। কবির ভাষায়;—

"শান্ত হয়ে সতী কহে "তবে ক্ষমি আমি।
যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামী।।
সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি।।
যদবধি তুমি কিংবা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর।।
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী-অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুতনারী।।[২৫]

—'শূরসুন্দরী' কাব্যে দেশীয় নারী শূরসুন্দরীর গৌরব বর্ণিত হয়েছে।

কাঞ্চী কাবেরী (১৮৭৯) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর একটি আখ্যান কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী'। কাব্যের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে প্রতিবেশী প্রদেশ উৎকল থেকে। কবি ভারতের যেখানেই বীররসাত্মক গৌরবময় কাহিনীর সন্ধান পেয়েছেন, তাকেই কাব্যরূপ দিয়ে কাব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে দেশানুরাগের অবেদন জানিয়েছেন। এই কাব্যের উৎসের মূলে আর একটি কারণ আছে, তা হল উৎকল দেশ সম্বন্ধে যারা অবজ্ঞা করত , তাদের মনের ভ্রমকে সঠিক পথে নির্দেশ করা। কবি বলেছেন;— "বস্তুতঃ উৎকলদেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে! "[২৬] কবি যেন বলতে চেয়েছেন, এই উৎকল দেশের এক সময়কার প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশের মানুষের গৌরব করার মতো বিষয়। এই কাব্যটিকে বলা যায়, ভারতের জাতীয় সংহতির কাব্য।

'কাঞ্চী কাবেরী' রচনা করার সময়ও কবি 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য রচনার বিষয়টি ভুলে যান নি। এখানে আধুনিক রুচিবান ও ভাববাদী উভয় শ্রেণীর বাঙালী পাঠকের প্রতি কবির সমান দৃষ্টি ছিল। কবি ভূমিকায় স্বীকার করেছেন কাব্যটির অনেক স্থানে অলৌকিকতার সন্ধান পাওয়া যাবে, যা আধুনিক রুচিবান পাঠক-মনের অনুপযুক্ত। তবে দু'টি ভিন্ন রুচির উপযুক্ত করে কাব্যটি রচনা করার দিকে কবি লক্ষ রেখেছেন। তিনি বলেন, যাঁরা সাত্ত্বিক হিন্দু তাঁরা ভগবান জগন্নাথের আলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডে বিশ্বাস করতে পারেন; আর যারা আধুনিক যুক্তিবাদী তাঁরা জগন্নাথের আলৌকিক বিষয়টিকে বুদ্ধিমান রাজার সৈন্যদের মনোবল বাড়ানোর একটি রাজকীয় কৌশল বলে গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া নারী স্বাধীনতা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদের পরিচয় পাওয়া যায় , যা উনিশ শতকের মনের ফসল। যেমন, কবি পাশ্চাত্যের নারীর অবমাননাকে প্রকাশ করেছেন এই ভাবে;—

"সভ্য-শিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল ।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল।।" (২৭)

এখানে ফ্রান্সের নারীদের পরাধীনতাকে কবি সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার শিক্ষিত শ্রেণীর একব্রহ্মে বিশ্বাসকে কবি ফুটিয়ে তোলেন এই ভাবে;—

"সকল দেবতা মাত্র কল্পনার ফল ।।
যিনি হরি , তিনি হর , তিনি প্রজাপ্রতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী।।
পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্ব্বেদ।
পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ।।" (২৮)

এখানে বেদের এক ব্রহ্মাকেই কবি উনিশ শতকের সচেতন মনের উপযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল কবি আধুনিক যুক্তিবাদী ও ভাববাদীদের কাউকেই নিরাশ না করে মধ্যমপন্থীর মতো এখানে বলেন; — "এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।" (২৯) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাঞ্চী কাবেরী' রচনা কালে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে কাব্যটি পরিবেশন করেন।

'কাঞ্চী কাবেরী' কাব্য রচনায় কবি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে স্বদেশ ভাবনা প্রচার করতে ভোলেন নি।প্রথম সর্গে উড়িষ্যার নানা ঐতিহ্যের বর্ণনা করেন। হিন্দু জাতির গৌরবের কীর্তি ইংরেজ সরকারের লোভে ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করে বলেন;—

" হায় রে ইংরাজ রাজ , করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্ত্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চুর, সেই বারোবাটীপুর ,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?" (৩০)

এখানে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজদের অন্যায় আচরণকে স্বদেশ প্রেমিকের মতো সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। 'কাঞ্চীকাবেরী'র উৎকল প্রদেশের বীরত্বমূলক কাহিনী ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে স্বাধীনতার জন্য গর্জে ওঠার আহ্বানমূলক কাব্য হিসাবে গণ্য ।

মধুসূদন দত্ত

উনিশ শতকে স্বদেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধান চোখে পড়ার মতো। বাঙালী ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কারের দ্বারা প্রগতি এনেছে। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) সাহিত্যকেই জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করেছিলেন এবং তিনি নিজ প্রতিভা ও সাহিত্যজ্ঞান মিশ্রিত করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বলা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যেমন সমাজসংস্কার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যেমন ধর্মসংস্কার অবিচ্ছিন্ন, বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতার সঙ্গে তেমনি মধুসূদন দত্ত একটি উল্লেখযোগ্য নাম । বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যই যেন তাঁর আবির্ভাব। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন — "রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, বাঙ্গালা কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদন সেইরূপ করিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" (৩১)

শিক্ষা জীবনের প্রথমে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর কাব্যরসে মধুসূদন মুগ্ধ হলেও হিন্দু কলেজে পড়তে এসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুরাগী হন। কবির এই সময়ের মনোভাব প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার বলেন;—"হিন্দু কলেজে পাঠের সময়, তিনি, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য, কখনও কখনও যে বলিতেন, যে "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল";" (৩২) আসলে মধুসূদন ছিলেন সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তি। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য সাহিত্য শিক্ষা তাঁর সহিত্যরস তৃষ্ণাকে তৃপ্তি এনে দিয়েছিল। তিনি তার প্রতিদান স্বরূপ ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। এই সময় থেকেই মধুসূদন স্বপ্ন দেখলেন ইংরেজী সাহিত্যে একজন বড় কবি হবেন। সেজন্য ইংরেজ-সংস্কৃতিকে অনুকরণ করলেন। যদিও সে অনুকরণ তাঁর অসংযমী জীবনাচরণকে প্রকাশ করেছিল । মধুসূদন সুরাপান প্রভৃতি ভোগবিলাসগ্রস্ত হয়ে অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায় তাঁর মনে হয়েছিল ইংরেজী ভাষায় কবি হওয়া বা ইংল্যাণ্ডে গমন করার পক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি অন্তরায় হতে পারে। এভাবেই মধুসূদন বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরেজ সাজলেন। বিদেশিনীকে বিয়ে করতে দ্বিধা করলেন না। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন;—

> "খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি মধুসূদনের আস্থা ছিল কিন্তু বিশেষ কোন টান ছিল না, বরং দেশের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার সহৃদয় অনুকূলতাই ছিল । শুধু সাহেব হইবেন এবং বিলাত যাওয়া সহজ হইবে এই ভাবিয়াই তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন।" (৩৩)

মাদ্রাজে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কবি হওয়ার স্বপ্নকে সার্থক করলেন 'Captive Ladie, Visions of the Past' লিখে। কিন্তু মধুসূদন যতখানি প্রশংসা আশা করেছিলেন তা তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। এই সময় বেথুন সাহেবের মত ব্যক্তি তাঁকে মাতৃভাষা চর্চার জন্য উপদেশ দেন। বন্ধু গৌরদাস বসাক বাংলা সাহিত্য অনুশীলনের

জন্য তাঁকে সব সময়ই পরামর্শ দিতেন। 'Captive Ladie , Visions of the Past'-এর অনাদর, বেথুন সাহেব ও বন্ধু গৌরদাসের বাংলা ভাষা চর্চার অনুরোধ ও প্রেরণা মধুসূদনকে বেশ ভাবিয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন; — " 'ক্যাপটিভ লেডী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইংরাজী সাহিত্যেরই অনুশীলন দ্বারা তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু এখন হইতে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল।"[৩৪] এমন সময় বন্ধু গৌরদাস বসাক তাঁকে কলকাতায় ফেরার পরামর্শ দেন। কলকাতায় এলে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সহযোগিতা মধুসূদনের বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের অনুৎকর্ষতা তাঁকে আহত করে। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র (১৮৫৯) প্রস্তাবনা (অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে, বঙ্গে[৩৫])-য় এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের অনুৎকর্ষতা দেখে মধুসূদন বাংলায় শিল্প সমৃদ্ধ নাটক লেখার পরিকল্পনা করেন। কিছু দিনের মধ্যেই লেখেন শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের এভাবেই পদার্পণ ঘটে। সময় থাকতেই মধুসূদন বিদেশী ভাষায় অমর আসন লাভ করার বাসনা ত্যাগ করেন। প্রথম জীবনে মাতৃভাষার প্রতি অনাদরের জন্য 'বঙ্গভাষা' কবিতা (হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—[৩৬])-য় তিনি অনেক অনুশোচনাও করেছিলেন।

কবি দেখলেন, বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে 'বিবিধ রতন' আছে, কিন্তু 'রতন' কে সমৃদ্ধ সাহিত্যে উন্নীত করার মতো প্রকৃত শিল্পীর অভাব। বাংলার নাট্য সাহিত্যের দুর্দশা মোচনের জন্য কলম ধরার পরেই তার মনে হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় বাংলা সাহিত্য খুবই দরিদ্র। বাংলা কাব্যের দরিদ্র-দশা মোচনের জন্য তিনি একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেন। কাব্যানুরাগী যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করার সময় মধুসূদন বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করা জরুরি। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সন্দেহ করলে মধুসূদন বলেন—

> "আমাদিগের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, আমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি স্বয়ং অমিত্রচ্ছন্দ কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?" [৩৭]

ডঃ সুকুমার সেনের মতে;— "যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে যেন বাজি রাখিয়া মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইতে ঝোঁক ধরিয়াছিলেন। এই ঝোঁকের ফল বাঙ্গালা কবিতায় যুগান্তর-সংঘঠন।" [৩৮] কিছুদিনের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে "তিলোত্তমা সম্ভব" (১৮৬০) নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে

উপহার দিয়ে বলেন;— "... আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্ব্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া, চরিতার্থ হইবেন।[৩৯] আজন্ম সাহিত্যের রসিক, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মধুসূদনের এই ধারণা ব্যর্থ হয় নি। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন;— "'তিলোত্তমাসম্ভব' হইতে বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে এক উন্নততর যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"[৪০] বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নই মধুসূদনের লক্ষ্য, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ এরকম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া য়ায়। মধুসূদন কাব্যদেবীকে বলেছেন;—

"কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? ঊর তবে, ঊর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর ঊরি ! কল্পনা-সুন্দরী—

হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে ,শশিকলা কৌমুদী যেমতি ।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!" [৪১]

—এ যেন কাব্যলক্ষ্মীর নিকট কবির প্রার্থনা-সঙ্গীত । কবি কাব্যলক্ষ্মীর করুণা লাভ করতে চেয়েছেন। কবির প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর করুণা বর্ষিত হলে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হবে, তাতে দেশবাসী বিশুদ্ধ কাব্যরস পানের সুযোগ পাবে। মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ কাব্য রচনার বাসনা মধুসূদনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদবধকাব্য' গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়।প্রথম সর্গে কাব্যের বিষয় ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে ।

"গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; ঊরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন- মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র," [৪২]

—মধুসূদন বীররসে কাব্য লিখতে চেয়েছেন, যা অভিনব না হলেও পুরাতন নয়। কেননা, ইতিপূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) -এ বীররসের অবতারণা হয়েছিল। তাছাড়া বাঙালীকে প্রচলিত কাব্যরস থেকে অব্যাহতি দিয়ে অভিনব রসে অভিনব সাহিত্য হিসাবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দিতে চেয়েছেন। কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন— বাঙালীকে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস দানের জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হয়েছে। মধুসূদনের ভাষায়;—

"গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" (৪৩)

—এই কাব্যাংশটির দ্বারা সে কথাই প্রমাণিত হয়। মধুসূদন ভারতবাসীর চির পরিচিত 'রামায়ণ' থেকে কাব্যের কাহিনী সংগ্রহ করলেও তাঁর কবি প্রতিভার দ্বারা অভিনবত্ব আনতে সক্ষম হয়েছেন। দেশী বিদেশী সাহিত্যে অভিজ্ঞ মধুসূদন কাব্যটিতে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত রাবণের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্বারা কাব্যটির ভাবের গভীরতা সৃষ্টি হয়েছে।

মধুসূদনের বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করার মনোভাবটি আরো স্পষ্ট করতে হলে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য', (১৮৬২) ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র উল্লেখ করতে হবে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গীতিকাব্য নামক অধ্যায়ে আলোচনা করায় এখানে বীরাঙ্গনা কাব্যটির আলোচনা করা হবে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার রীতি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এই কাব্যে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'দ্বারকনাথের প্রতি রুক্মিণী', 'দশরথের প্রতি কেকয়ী', 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা', 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী', 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী', 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা', 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী', 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী', 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'পত্র লিখেছে। এই এগারো জন নায়িকার তাদের স্বামী, প্রেমিক বা প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে রচিত পত্রও যে কাব্য হতে পারে, তা সে দিনের বাঙালী পাঠকের কাছে বিস্ময়। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন;— "সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' প্রণয়ন করিয়াছেন।" (৪৪)

মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর কাহিনী স্বদেশের স্বাধীনতার লড়াই, তবুও তাঁর সমকালে তিনি খুব জনপ্রিয় কবি ছিলেন না। কাব্যগ্রন্থ দু'টির কাহিনীর সমকালের পাঠকের মনে পরাধীনতার গ্লানি জাগিয়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। যদিও তা সমকালে সার্থকতা পায়নি। মধুসূদনের কাব্যে বিদেশী কাব্যের প্রভাব, কবির খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুকরণের মত বিষয়গুলি অনেক পাঠকের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। সজনীকান্ত দাস বলেন;— "বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিবেচিত

হইয়া থাকে , কাহারও কাহারও মতে শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য হিসাবে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপরেও ইহার স্থান।" [৪৫] এখানে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর উপরে স্থান দেওয়ার কারণ হল মধু কবির বিদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি সমর্থন ।

কিন্তু মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' তথা তাঁর অন্যান্য রচনায় কেবল স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদেশীর আচার সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগই প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। মধুসূদন-সাহিত্যের আলোচনা করলে কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না । পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য কলম ধরেছিলেন। সাহিত্য অধ্যয়ন ও অনুশীলন ব্যতীত তাঁর জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকম একজন সাহিত্য-পিপাসু মানুষ প্রথম জীবনেই ইংরেজী তথা বিদেশী সাহিত্য রস আস্বাদন করে তৃপ্ত হয়েছিলেন। এবং স্বপ্ন দেখেছিলেন —এই তৃপ্তিদায়ক ইংরেজী সাহিত্যে তিনি অমর আসন লাভ করবেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন যে সার্থক হবার নয়,— সেকথা বুঝতে পেরে তিনি মাতৃভাষা অনুশীলনে মগ্ন হন। মাতৃভাষাকে ভাবের গভীরতা ,রসের বৈচিত্র্য ও প্রকরণে অভিনবত্ব এনে বাংলা সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তন করেন। —এ তো বাংলা সাহিত্যের জগতে এক বিরাট পাওনা। মধুসূদনের কাব্যের বিষয়ও স্বদেশীয় ভাবনার অনুকূল। উনিশ শতকের প্রকৃত শিক্ষার চেতনা বাঙালীকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরাধীনতার গ্লানি বাঙালীকে আহত করত। এরকম একটি পটভূমিতে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ দেবরাজ ইন্দ্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই পরাধীন পাঠককে উৎসাহ দেবে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ক্ষেত্রেও ওই একই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। যদিও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর কাহিনী চিরাচরিত ভারতীয় বিশ্বাসকে আঘাত হেনেছে । অর্থাৎ যে রাম, লক্ষ্মণ দেবতা হিসাবে পরিচিত সেই রাম, লক্ষ্মণকে মধুসূদন কাপুরুষ, স্বাধীনতা হরণকারী হিসাবে অঙ্কন করেছেন । অন্যদিকে রাবণ ও মেঘনাদকে বীর ও দেশপ্রেমিক চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করেন। সেদিনের অনেক পাঠক মধুসূদনের এরকম কাহিনী ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন নি । আমরা এসব বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি — মধুসূদন কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সমৃদ্ধ সাহিত্য হিসাবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর আবেদন স্বীকার করতেই হবে। কবি রাবণের জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি অঙ্কন করতে চেয়েছেন। একদা সৌভাগ্যশালী রাবণ নিয়তির ষড়যন্ত্রে ধীরে ধীরে সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়ার আবেদনই কাব্যটির মূল আকর্ষণ। এখানে বিদেশী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মধুসূদন , বিধর্মী কবি মধুসূদন, ভারতীয় চিরাচরিত বিশ্বাসে আঘাতকারী মধুসূদনের কথা ভুলে সাহিত্যরস পিপাসু মন নিয়ে কাব্যটি পাঠ করলে আমাদের মনে হবে 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর কবি বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যই এরকম অভিনব কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া কবি সীতা হরণের মতো পাপাচারকে মেনে নেন নি । চিত্রাঙ্গদা স্বামী রাবণের এই পাপাচারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে;—

"কিন্তু ভেবে দেখ , নাথ , কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ , রাজা , এসেছে এ দেশে
রাঘব ?" (৪৬)

—রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের মতো ঘৃণ্য কাজের নিন্দা করা হয়েছে । এবং বলা হয়েছে রামচন্দ্র সেজন্যই রাবণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। আসলে মধুসূদন যুদ্ধের মূল কারণকে গৌণ করে স্বদেশ রক্ষায় রাবণের ট্র্যাজিক পরিণতিকে মুখ্য করেছেন । 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অনেক অংশে দেশপ্রেমের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। —যা অনেক সময় কবি মনের দেশানুরাগকেই প্রকাশ করে। যেমন –

"জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শতধিক্ তারে!"(৪৭)

—জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা একটি পবিত্রতম কাজ । এখানে জন্মভূমি রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করার জয়গান গাওয়া হয়েছে। এবং যে ব্যক্তি এই মহৎ কর্মে বিরত হয় তাকে মুর্খের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । কিংবা দেশ যখন বিপন্ন , বিদেশী শত্রু দেশের স্বাধীনতা হরণ করতে তৎপর তখন কিন্তু প্রকৃ ত দেশপ্রেমিক ভোগবিলাসে মগ্ন থাকতে পারে না । ইন্দ্রজিত বলেন;—

"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা , হেথা আমি বামাদল মাঝে ?" (৪৮)

—ইন্দ্রজিতের শিক্ষা বা চেতনা নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। কেননা স্বদেশ আক্রান্ত; —এ সময় তাঁর মত বীরপুরুষের ভোগবিলাসে মগ্ন থাকাটা নৈতিক ভাবে অন্যায় । 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ দেশপ্রেমের আরো সুগভীর ভাবনা রয়েছে ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিতের বক্তব্যে । যে বক্তব্য গুলি শুধুমাত্র ইন্দ্রজিতের বক্তব্য মনে হবে না, সেই বক্তব্য যেন স্বয়ং কবি মধুসূদনের। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মেঘনাদ চরিত্র কে একটি আদর্শ চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সে জন্য চরিত্রটির প্রতি তাঁর সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার অভাব ছিল না । কবি এই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ভেবেছেন । এর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মধুসূদনেরই লেখা কয়েকটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এই চিঠিতে কবি মধুসূদন ইন্দ্রজিৎকে তাঁর আন্তরিক চরিত্র হিসাবেই উল্লেখ করেছেন । "...I am going to celebrate the death of my fevourite Indrajit" (৪৯) কিংবা রাজনারায়ণ বসুকে লেখা আরেকটি চিঠিতে মেঘনাদ ও কবির একাত্ম হওয়ার কথা

জানা যায় —

"A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish him. Thank Heaven. I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Books in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him."[৫০]

অতএব মেঘনাদ চরিত্রটি কবির প্রিয় চরিত্র। এই প্রিয় চরিত্রের কোন রকম কলুষতা থাকতে পারে না। মেঘনাদ এমন কোন কাজ করবে না যা কবির অপছন্দ। অর্থাৎ মেঘনাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ কবি মধুসূদনের স্বীকৃত। মেঘনাদ স্বদেশকে ভালবেসেছিল, এই স্বদেশ-বৎসলতাও কিন্তু মধুসূদনের অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক । মেঘনাদ যখন বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে বলে;—

" ধর্মপথগামী ,
হে রাক্ষসরাজানুজ , বিখ্যাত জগতে
তুমি;— কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, -এসকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুনহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!" [৫১]

—এই বক্তব্যে মেঘনাদের স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে মেঘনাদ চরিত্রের মুখ দিয়ে কবি নিজের মনের কথাটিই যেন বলেছেন। কবির এই মনের গোপনতম সংবাদটি যেকোন দেশের যে কোন কালের মানুষকে দেশানুরাগের মহৎ মন্ত্রে উজ্জীবিত করবে ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের বা মহাকাব্যের কবি হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ -১৯০৩)। তাঁর এই শ্রেণীর বিখ্যাত দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু' (১৮৬৪) ও 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড ১৮৭৫, ২য় খণ্ড ১৮৭৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১) লিখে ইতিমধ্যে কাব্য চর্চায় হাত পাকিয়েছেন। এরপর একে একে 'বীরবাহু' (১৮৬৪), 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড ১৮৭৫ ও ২য় খণ্ড ১৮৭৭), 'আশাকানন'

(১৮৭৬), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) এছাড়া অনুবাদ কাব্য — 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'নলিনী বসন্ত' (১৮৭০), 'রোমিও জুলিয়েত' (১৮৯৫) রচনা করেন এবং হেমচন্দ্র তাঁর প্রতিভার দ্বারা আরো বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন— 'কবিতাবলী' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ১৮৭০, ১৮৮০) দুই খণ্ডে এবং 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) নামে গীতিকাব্য গ্রন্থ রচনার দ্বারা।

এখানে হেমচন্দ্রের রচিত কয়েকটি আখ্যানকাব্যের আলোচনা করে বাঙালীর আত্মবিকাশে সেগুলির গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে ।

বীরবাহু ঃ

সমগ্র মধ্যযুগ তো বটে, এমন কি আধুনিক যুগেও বহুদিন এই বীরভূমি ভারতবর্ষ পরাধীন। অথচ প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের শৌর্য বীর্য ভুবন-বিখ্যাত ছিল। এদেশে আধুনিক ভাবধারা প্রচারে স্বজাতির ঐতিহ্যে গর্বিত ইতিহাস সচেতন কবি হেমচন্দ্র প্রাচীনকালে হিন্দু বীরের একটি কল্পিত কাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছিলেন। কাব্যের বিজ্ঞাপনে তিনি স্বীকার করেন; —"পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।" [৫২] 'বিজ্ঞাপন' থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়— আত্মভোলা বাঙালীকে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই ছিল কাব্যটি রচনার উদ্দেশ্য।

কাব্যটির কাহিনী দেশানুরাগ মূলক। বীরবাহু আত্মভোলা হয়ে যাবতীয় সুখভোগে রত ।এক সন্ন্যাসিনী এসে তাঁকে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সচেতন করে। ইতিমধ্যে বিদেশী 'ম্লেচ্ছ' তাঁর রাজ্য দখল করার জন্য এগিয়ে আসে। অকস্মাৎ সচেতন বীরবাহু বিদেশীদের হাতে হারায় রাজ্য, রাজধানী এমন কি পত্নী হেমলতাকেও। এরকম চরম বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বীরের মতো যুদ্ধ করার জন্য বীরবাহু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তাঁর ভাষায়—

"যত দিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ
তত দিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ।।" [৫৩]

স্বদেশভূমি পরাধীন, এ যন্ত্রণা তাঁকে দগ্ধ করে। সে জন্য স্বদেশ প্রাণ বীরবাহু দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে বলেন;—

"মা গো ও মা জন্মভূমি! আরো কত কাল তুমি,

এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।

পাষণ্ড যবন দল, বল আর কত কাল ,

নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ।।" (৫৪)

—বীরবাহুর অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও দেশোদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত বাস্তব রূপ পায়। বীরবাহু বীরের মতো যুদ্ধ করে দেশের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ।

'বীরবাহু' কাব্যের এই কাহিনী পাঠ করে আমাদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না, কাব্যটি উনিশ শতকের আত্মবিস্মৃত জাতির হারানো গৌরব উদ্ধারের মহৎ প্রেরণার কথা ।

বৃত্রসংহার কাব্য (১৮৭৫, ১৮৭৭) ঃ

এহমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' বাংলা সাহিত্যের আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য ধারার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসাবে পরিচিত। কাব্যটি প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস বলেন;—

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাহিনী কাব্যগুলি লইয়া বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছিল; আজ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে সাময়িকপত্র ও সমালোচনাগ্রন্থের বিপুল বাক্যোচ্ছ্বাস হইতে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি যে, সাময়িক ভাবে হেমচন্দ্রের কবি-যশ সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহাকবিরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন।" (৫৫)

একথা ঠিক সাময়িক ভাবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। আমরা আলোচনা করব যে বৃত্রসংহার কাব্যটির মূল বিষয়বস্তু। এবিষয়ে তারাপদ মুখোপাধ্যায় সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়;—

> "বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিপতাকা। মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের ক্লাসিক কল্পনার সিংহদ্বার যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, এই কাব্যের বজ্র-গম্ভীর ও ললিত মধুর শব্দমন্ত্র এবং উদাত্ত সঙ্গীত ধর্ম্ম যাহাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই, তাহারা বৃত্র-সংহারের বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়াছে। বৃত্র-সংহার যেন মেঘনাদ-বধ কাব্যের শিশু সংস্করণ। তাই রস ও রুচি যাহাদের খুব সূক্ষ্ম নয়, তেমন রসিকেরাই বৃত্র-সংহারের ন্যায় কৃত্রিম আড়ম্বর কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে।" (৫৬)

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের উক্ত সিদ্ধান্ত যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন দত্তকে অতিক্রম করতে পারেন নি। বরং প্রতি পদক্ষেপে অনুকরণ করেছেন। যেখানে অনুসরণ করেন নি সেখানেই তাঁর দুর্বলতা ও মৌলিকতা। এবিষয়ে তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন;—

> "মেঘনাদ-বধ কাব্যের যে অংশটুকু গ্রহণ করিলে যুগমনের নিকট হইতে বাহবা পাওয়া যাইবে, তিনি কেবল সেই বাহ্য কাব্য-কৌশলটুকু গ্রহণ করিলেন। ...ইহাতে মেঘনাদ-বধের উত্তাপ আছে, কিন্তু আদর্শ নাই; ইহা মেঘনাদ-বধের যুগোপযোগী বাঙ্গালী সংস্করণ। সে যুগ এই কাব্য কঙ্কালকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। হেমচন্দ্র তাঁহার যুগের কাছে নিজের আসন উচ্চ করিতে গিয়া মধুসূদনকে প্রতারণা করিয়াছেন;" (৫৭)

সেদিনের পাঠকের একটি অংশ মধুসূদনের শৃঙ্খলাহীন জীবনকে মেনে নেয় নি। মধুসূদনের পরেই আবির্ভাব হেমচন্দ্রের । সেজন্য যেখানে হেমচন্দ্রের দুর্বলতা ও মৌলিকতা ঠিক সেই বিষয়গুলি পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়েছে । তারা বিদেশী সংস্কৃতি ঘেষা মধুসূদনের পাশে দেশীয় সংস্কৃতি অনুরাগী কবির আবির্ভাবে পুলকিত। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ পাঠকের ভাল লাগার বিষয়গুলি হল ; -

১। কাহিনী নির্বাচন

২। জাতীয় ভাবাবেগের প্রতি কবির শ্রদ্ধা

৩। পরাধীনতার গ্লানি

৪। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মত ও পথের অবতারণা।

ভারতের অধিকাংশ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী। তারা পুরাণে জেনেছেন — ভারতবর্ষ দেবভূমি। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এর বিষয় পরাধীন দেবভূমির স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও সাফল্য। নায়ক ইন্দ্র, তিনি সিংহাসনচ্যুত। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতার কঠোর পরিশ্রমে পুনরায় স্বর্গভূমি উদ্ধার হয়। হেমচন্দ্রের এই জাতীয় কাহিনী সমকালে অধিকাংশ পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়। তাঁরা যেন এই কাহিনীর মধ্যে তাঁদের স্বভূমি ভারতবর্ষের পরাধীনতাকে অনুভব করেন । 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ এই কাহিনী উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অনুকূল ।

হেমচন্দ্র যখন বৃত্রসংহার কাব্য লিখছিলেন, তখন স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন বাঙালী অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ধর্ম , সাহিত্য , দর্শন ও নানামুখী জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। সচেতন বাঙালী আর যাই হোক প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে পরশমণির মতো ভাবতেন। ইতিপূর্বে- 'মেঘনাদবধ কাব্য '-এ মধুসূদন বাঙালীর তথা ভারতের প্রাণের সামগ্রী রামচন্দ্রকে বর্বর কাপুরুষ চরিত্র রূপে সৃষ্টি করেন; কিন্তু হেমচন্দ্র মধুসূদনের পথে না গিয়ে ইন্দ্র ও দেব চরিত্রের মহিমাকে স্বীকৃতি দেন। পাঠকের কাছে কবির এজাতীয় চিন্তা চেতনা যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। আসলে হেমচন্দ্র ধর্মের জয় বা জাতীয় ভাবাবেগে আস্থা দেখিয়েছেন। মধুসূদনের মত কাব্য শিল্প সমৃদ্ধির স্বার্থে নতুন কোন জীবনদর্শন উপস্থাপন করেননি । মধুসূদনের থেকে এখানেই তাঁর মৌলিকতা বা দুর্বলতা যা তাঁকে সমকালে বিখ্যাত করেছিল ।

একটি জাতির স্বাধীনতা বা পরাধীনতার বিষয় নির্ভর করে জাতীয় চেতনার উপর। বাস্তবিক কোন জাতি পরাধীন হয়েও যদি পরাধীনতার গ্লানি জাতির মনে দানা না বাঁধে, তবে সেই জাতির স্বাধীনতা দূর অস্তমিত। পরাধীনতার গ্লানি অনুভবের অর্থ জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এর দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত। তিনি সুমেরু প্রদেশ স্বভূমি উদ্ধারের চিন্তায় মগ্ন। সেখানে নিয়তি দেবীকে পূজায় তুষ্ট করে কি উপায়ে মাতৃভূমি উদ্ধার করা যায় তা জানতে চাইলেন। ইন্দ্র বলেন—

" কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্যকুলপতি বৃত্র; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে ,
কত দিনে পূর্ণ হ'বে দেবের দুর্গতি?" (৫৮)

ইন্দ্র পরাধীনতার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন । সে জন্য এই পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় জানার জন্য তিনি ব্যাকুল। এদিকে সূর্যদেব বৃত্রের কাছে দেবতাদের পরাজয়কে এক চরম অপমান মনে করেন। তার ভাষায়—

" ধিক্ লজ্জা ! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে ,
নিষ্কন্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর !
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া,—
স্বর্গ-বিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল!" (৫৯)

সমস্ত দেবদেবী স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। দেবদেবীহীন স্বর্গের সুখভোগের অধিকারী বৃত্র ও তার দলবল। ইন্দ্র পত্নী শচীদেবী দানব দলের স্বর্গভোগের চিন্তায় ব্যথিত। বিশেষত তাঁর শয়নাগারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন; —

"হায় লজ্জা ! চপলা রে,— আমার শয়নাগারে ;
অমর পরশে নাহি যাহা ,
ইন্দ্র বিনা সে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন ,
বৃত্রাসুর পরশিলা তাহা !
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্ , কি আর কব অধিক ,
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে! " (৬০)

শচীদেবীর এ পীড়ন পরাধীনতার গ্লানিরই নামান্তর ।

কোন বৃহৎ ও মহৎ কাজ করতে হলে চাই একনিষ্ঠতা ও ত্যাগ। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ এই দু'টি বিষয়ই স্পষ্ট। কি উপায়ে পুনরায় স্বভূমি উদ্ধার করা সম্ভব তা জানার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র 'কুমেরু শিখরে ধ্যানে মগ্ন। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও নিয়তিদেবীর সাক্ষাৎ না পেলেও তিনি হতাশ হন নি। তাঁর ভাষায়;—

" অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত ।"(৬১)

—সুগভীর একনিষ্ঠতা থাকলে সাফল্য আসতে বাধ্য । কবি বলেন ; —

"এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর
বসিতে পূজায় পুনঃ ; নিয়তি তখন
আবির্ভাব হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার " (৬২)

দেবরাজ পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধের কষ্টকে মূল্য দিতে চান না। তিনি স্বর্গ উদ্ধার ও বন্দী মাকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে চলেছেন। দৈত্য বিনাশে তিনি একনিষ্ঠ। শচীদেবী বলেন —

"জননী, ছাড়িব তোমা? যাতনার ভয়?
চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননী ;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণি ;
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষবার
তব আশীর্ব্বাদে শিবত্রিশূলপ্রহার!' (৬৩)

—জয়ন্তের কাছে শিবের ভয়ঙ্কর ত্রিশূলের যন্ত্রণাও তুচ্ছ হয়ে উঠেছে।

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য চাই অনেক ত্যাগ। পরহিতে ত্যাগ একটি পবিত্রতম কাজ। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ দেবরাজ ইন্দ্রের স্বভূমি উদ্ধারের জন্য ঋষি দধীচিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দধীচি জানেন, পরহিতে ত্যাগ একটি শুভ কাজ। তাঁর দেহত্যাগের প্রশ্নে শিষ্য মণ্ডলী কাতর হলে, তিনি বলেন;—

"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভব-মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন !
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যাজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?" (৬৪)

দধীচি তাঁর শিষ্যদের পরহিতে উৎসাহিত করেছেন। এখানে পরহিতে ত্যাগ ধর্মের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অর্থাৎ 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একনিষ্ঠতা ও ত্যাগের বিষয়টি স্বীকৃত।

উনিশ শতকের সচেতন অনেক বাঙালী জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত। তাঁরা পরাধীনতার যন্ত্রণায় ব্যথিত। ঠিক এমন সময় পরাধীনতাকে বিষয় করে, সচেতন পাঠককে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়ে মুক্তির জন্য একনিষ্ঠ ও ত্যাগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের বাঙালীর মনের কথাটি বলেছেন। সমকালের অধীনতার নাগপাশ থেকে যা মুক্ত হওয়ার প্রেরণার জোগান দিয়েছিল।

'বীরবাহু' ও 'বৃত্রসংহার কাব্য' নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ দু'টি ছাড়া অনান্য আখ্যান কাব্যেও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ, দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গঠনমূলক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'চিন্তাতরঙ্গিনী' কাব্যের নায়ক নরসখা চিন্তাতরঙ্গে আকুল। নরসখার মনে একটি অনুভূতি কাজ করে চলেছে। সে বাস্তব সংসারে দেখছে নানাবিধ অনাচার , দুরাচার, হিংসা — যা মানবতার পরিপন্থী। নরসখা অভিযোগের সুরে বলেছে;—

"কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল ।।" (৬৫)

নরসখা দেখছে — দেশাচার হরণ, স্বদেশের দুঃখ মোচন, সমাজে প্রেম-প্রীতি প্রচারের মত একাধিক

মহৎ কাজ বাকি আছে। বন্ধু কমলকে বলেছে ;—

"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল ।
কি হবে থাকিয়া হেথা, প্রাণের কমল।।" (৬৬)

উনিশ শতকে উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। নরসখা যেন এঁদেরই একজন। কিন্তু সে সমাজের জটিলতাকে মেনে নিতে পারেন নি। নরসখা প্রাণকে তুচ্ছ মনে করে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। কাব্যটি পাঠ করার পর মনে হয় — এ যেন আত্মহত্যা নয়। বরং দেশ, সমাজ ও মানবতার অপমানে ব্যথিত এক দেশপ্রেমিকের আত্মবলিদান।

'আশাকানন' কাব্যকে বলা হয় — জগৎ ও জীবনের কাব্য। 'আশাকানন' এর প্রকাশক শ্রী উমাকালী মুখোপাধ্যায় বলেন;— "আশাকানন একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য।" (৬৭) তবুও এই কাব্যে হেমচন্দ্র স্বদেশকে এড়িয়ে যাননি। 'আশাকানন' এর 'ভূমিকা'-য় সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বলেন ;—

"তিনি মানবের কাব্য, জগতের কাব্য লিখিতে চাহিলেন।'আশাকানন' সেই ইচ্ছার ফল। তবু তিনি স্বদেশকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই, বাল্মীকির সাক্ষাতে দেশমাতার দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন।" (৬৮)

ব্যাস, কালিদাস, ভারবি, শংকর প্রমুখ ঋষি, কবি, নাট্যকার ও দার্শনিকের পর বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কবিতার ভাষায় ;-

দিল পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরঘ্রাণ লৈয়ে ;
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায়;
ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যভূমে
তাঁহার বীণা বাজায়; (৬৯)

বাল্মীকি স্বদেশীকে দেখে স্বদেশের সংবাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হন । ঋষি বাল্মীকি স্বদেশের সুসংবাদ শুনে মনকে তৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী ব্যক্তিটি কিন্তু দেশের গৌরবময় বার্তা শোনাতে পারেন নি। কবি লিখেছেন;—

" কহিনু তখন কি বলিব ঋষি
কি দিব সম্বাদ তার –
তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল
সে আর্য্য নাহিক আর ;
ডুবেছে এখন কঙ্কাল সলিলে
নিবিড় তমাসা তায় ;" (৭০)

'আশা কানন'-এর উক্ত কবিতাংশে অযোধ্যা তথা দেশের দুরবস্থার বিষয়টি স্পষ্ট। তবে কাব্যটি শেষ পর্যন্ত নিরাশার কাব্য হয়ে থাকে নি। ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে তার ইঙ্গিত আছে । কবির ভাষায়;—

" তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখ আর্য্যকুল;
দেখরে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কিরূপ বেশ;
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচা রে মনের ক্লেশ"।
দেখিলাম চাহি যেন পূর্ব্ব দিক্
জ্বলিছে কিরণময়,
ভারতমণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয় ;
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে;" (৭১)

সমকালীন পরাধীন ভারতের পটভূমিতে কবি হেমচন্দ্রের এজাতীয় বার্তা পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে এমন দাবি করা যায়। আমরা আলোচনা শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি — কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যানকাব্য রচনা করতে গিয়ে বাঙালীর আত্মচেতনার বিকাশে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন ।

নবীনচন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে পরিচিত যদিও 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম খণ্ড ১৮৭১, ২য় খণ্ড ১৮৭৮) নামে গীতিকাব্য, খৃষ্ট (১৮৯১) অমিতাভ (১৮৯৫) ও অমৃতাভে (১৯০৯) নামে তিনখানি জীবনী কাব্য, 'আমার জীবন' নামে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) গদ্যে নিজ জীবনী গ্রন্থ, 'ভানুমতী' (১২০৭ বঙ্গাব্দে) নামে একটি উপন্যাস এবং কবির প্রথম গদ্য রচনা 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রকরণকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে আমরা নবীনচন্দ্র সেনের আখ্যানকাব্যের আলোচনা করব। কবির এই আখ্যানকাব্যগুলি বাঙালীর আত্মবিকাশে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে —তারই অনুসন্ধান করা হবে । কবি নবীনচন্দ্র সেনের এই শ্রেণীর কাব্যগুলি হল--'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) ও 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) নামকত্রয়ী কাব্য।

পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫ ঃ

'পলাশির যুদ্ধ' ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে রচিত। বলা চলে, পরাধীনতার যন্ত্রণা অনুভব মূলক কাব্য 'পলাশির যুদ্ধ'। এই কাব্যে বাঙালীর পরাধীনতার দু'টি রূপ পাওয়া যায়। যথা;—দীর্ঘ পরাধীনতার যন্ত্রণা ও যবনের হাত থেকে ইংরেজের নিকট বাঙালীর পরাধীনতার হস্তান্তরের বৃত্তান্ত ।

পলাশির যুদ্ধকে বাঙালীর প্রথম স্বাধীনতা হারানোর যুদ্ধ বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, বাঙালী দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শত বছর পূর্বে স্বাধীনতা নামক অমূল্য রত্নটি হারায়। দেশীয় প্রজাসাধারণের বা বাঙালীর দীর্ঘদিনের পরাধীনতার গ্লানি কাব্যটিতে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে । মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন;—

"কিন্তু কি করিবে সখে! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গ প্রতি। বলিতে না পারি
লিখেছেন বিধি হায়! কত যে কি দুখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী!
সেনকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরকের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে!
সেই দিন হ'তে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
পড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্যসুত-বল" (৭২)

— এখানে কবি বাঙালীর দীর্ঘ পরাধীনতার কালকে নির্দেশ করেছেন। পলাশির যুদ্ধের প্রথম সর্গে কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ প্রমুখ নবাব সিরাজের অত্যাচার থেকে নিজেদের ও সমগ্র বাঙালীর মুক্তির জন্য সিরাজের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। কেননা, সিরাজের অধীনে থাকার অর্থ ধর্ম, মান ও জীবনের অনিশ্চয়তা । রাজবল্লভ বলেন;—

"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন ।
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত ।

— — —

কিছুদিন আর ,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না, — থাকিবে না কুলশীলমান "[৭৩]

—অতএব এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তির উপায় ইংরেজদের দ্বারা সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করা। কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মী বা বঙ্গমাতার ইচ্ছা বাঙালী নিজ বাহুবলে স্বাধীন হোক। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তিনি বলেন;—

" আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি , নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী ,
বঙ্গ-স্বাধীনতা - ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।" [৭৪]

বঙ্গমাতা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ সন্তানকে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হওয়ার আহ্বান করেন । তিনি তাদের আরো সাবধান করে বলেন;—

"ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী,
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে ?

— — —

বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্বস্থাপন ।" (৭৫)

বরং বাঙালী এ অবস্থায় অনেক ভালো আছে। কেননা, মুসলমান নবাব-বাদশাহ খুবই দুর্বল। তাদের পতন সময়ের অপেক্ষা। বঙ্গমাতা বলেন;—

" বিশেষ তাদের এই পতন-সময় ;
কি পাতশাহ , কি নবাব , আমাদের করে
পুতুলের মত , — — —
আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার ।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ , রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে , শিবিরে , হিন্দু প্রধান সহায় ।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয়;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।" (৭৬)

প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের পরাধীনতার অবসান আসন্ন প্রায় ।এ মুহূর্তে ইংরেজের মতো দুর্ধর্ষ জাতিকে রাজতন্ত্র হস্তান্তর করার কোন মানে হয় না। আসলে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়ে পাঠককে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করে। কবি নবীনচন্দ্র সেন পাঠককে বলেছেন ; --

"পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক।" (৭৭)

স্বাধীনতা অমূল্য সম্পদ। পরাধীন স্বর্গের চেয়ে স্বাধীন নরক কিংবা ক্ষমতাহীন ভূপতির থেকে ভিখারী হওয়াও ভালো, সমকালের শিক্ষিত ও সচেতন অথচ পরাধীন বাঙালীকে এইসব বক্তব্য যথেষ্ট ভাবাবে — একথা বলাই বাহুল্য ।

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ঃ

নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থ তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ীকাব্য' বলা হয়। কাব্য গ্রন্থগুলির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে 'মহাভারত' থেকে। কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অনাচারী ধর্মকে নিষ্কাম ধর্মে, জাতি বর্ণভেদেপরিপূর্ণ সমাজকে উদার মানবতায় ও ছিন্ন খণ্ড ভারতমাতাকে অখণ্ড দেশমাতৃকা হিসাবে গড়ে তোলেন। সমকালের ছিন্ন খণ্ড , বর্ণভেদে পরিপূর্ণ , অধর্মে আক্রান্ত ভারতের জন্য যা অনুসরণযোগ্য ।

রৈবতক , কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস আপাত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত । তিনটি খণ্ডের তিনটি আলাদা কাহিনীও রয়েছে। 'রৈবতক'-এ আছে সুভদ্রা হরণের কাহিনী, 'কুরুক্ষেত্র'-এ বালক অভিমুন্যর বীরত্বে ভরা মৃত্যুর কাহিনী ও 'প্রভাস'-এ কৃষ্ণ সহ যদু বংশ ধ্বংসের কাহিনী। এই তিনটি কাহিনী আপাত বিছিন্ন , সম্পর্ক তেমন নেই । বিছিন্নভাবে কাব্যগুলি পাঠ করলে কাব্যের মূল আবেদন অনুভব করা কঠিন হবে। তাতে একাধারে কবির উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণ কাব্যরস থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এর কারণ কি? বলা যায়, এর কারণ কবি নবীনচন্দ্র সেনের অভিনব মহাভারত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় তিনটি কাব্যকে 'ত্রয়ী' কাব্যরূপে রসোত্তীর্ণ করেছে । আমরা কাব্য তিনটি আলোচনা করলে বুঝতে পারব, —'রৈবতক'-এ মহাভারত গঠনের মহৎ পরিকল্পনা আছে, 'কুরুক্ষেত্র'-এ সেই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ প্রাপ্তির জন্য কর্মপ্রয়াস এবং 'প্রভাস'-এ তার পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ প্রাপ্তি ঘটেছে ।

'রৈবতক' কাব্যের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্মীয় অনাচারের সমালোচনা করেন । তৃতীয় সর্গে কৃষ্ণ , ব্যাস ও অর্জুন দেশের দুরবস্থা নিয়ে কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন— জাতিভেদ, হিংসা অনাচারী ধর্ম প্রভৃতির দ্বারা ভারত আক্রান্ত । ব্যাসদেব সমর্থন করেন;—

"সত্য, বাসুদেব,
বড় শোচনীয় দশা আজি ভারতের।" (৭৮)

—শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব দেন এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন স্থাপনের জন্য ।

দ্বাদশ সর্গে এই মহৎ কাজ করার জন্য ব্যাস ও অর্জুনকে শপথ করতে দেখা যায়। সপ্তদশ সর্গে অর্জুন

নরসংহারক যুদ্ধে আপত্তি করলে কৃষ্ণ বলেন — সমাজ শরীরকে সুস্থ করতে অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য রক্ত ঝরালে পাপ হয় না ।

অতএব তৃতীয় সর্গ, দ্বাদশ সর্গ ও সপ্তদশ সর্গে কৃষ্ণের নব-ভারত গঠনের যে পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, তা কাহিনীকে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ পর্যন্ত প্রসারিত করে ।

'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের প্রথমেই ব্যাসদেব তাঁর শিষ্যকে বুঝিয়েছেন,—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধ্বংসের যুদ্ধ নয়; ধর্মরক্ষার যুদ্ধ। নবম সর্গে ভীষ্মদেব ধর্মযুদ্ধের বিষয়টি মেনে নেন এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্যকে অনুভব করেন । সেজন্য ষোড়শ সর্গে বীর বালক অভিমুন্যর মৃত্যুর শোক মহাভারত গঠনের প্রয়াসে বাধা হয় নি ।

কুরুক্ষেত্রের ধর্ম যুদ্ধ শেষ হলেও মহাভারত গঠন বা আদর্শ দেশ গঠনের কাজ তখনও শেষ হয়নি । হয়নি আর্য অনার্যের মিলন, ব্রাহ্মণের অহংকার তখনও রয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল যদুকুল তখনও বিরাজমান, সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য তখনও সম্পূর্ণ প্রচার পায়নি। এগুলির পরিপূর্ণতা 'প্রভাস' কাব্যে । চতুর্থ সর্গে অনার্যরাজ বাসুকি স্বীকার করেন— কৃষ্ণ নাম প্রচারে অনার্যভুমি হয়েছে আনন্দভূমি । পঞ্চম সর্গে কৃষ্ণ-প্রেমে আর্য-অনার্য ভেদ মুছে গিয়েছে। নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন;—

" আর্য্য কি অনার্য্য নাহি কিছু জ্ঞান ,
গাহিছে নাচিছে গলাগলি করি ,
করিতেছে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান। " (৭৯)

কৃষ্ণ চেয়েছিলেন মহামিলন। এই কাব্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিনিধি দুর্ব্বাশা, অনার্যরাজ বাসুকি সকলেই কৃষ্ণ প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।পরিশেষে খণ্ডতা, ষড়যন্ত্র , হিংসা-প্রতিহিংসা ভুলে গিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অনার্য বর্ণ-নির্বিশেষে নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত পরিকল্পনা সার্থকরূপ লাভ করে ।

আমরা এক মহাভারত গঠনের অখণ্ড কাহিনীর কথা জানলাম। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কবির উদ্দেশ্য কি এপর্যন্তই ? নবীনচন্দ্র সেন তিনটি কাব্যের মধ্যে একটি ভাববস্তুকে ধরতে চেয়েছিলেন । তা হল হিংসা , ষড়যন্ত্র, বিভেদ, খণ্ডতা মুছে দিয়ে এক ধর্ম, একজাতি ও এক রাষ্ট্রের ভারত গঠন। আসলে কবি উনিশ শতকের ভারতের সঙ্গে মহাভারতের যুগের ভারতের সাদৃশ্য অনুভব করেন । তিনি ভারতের দুই যুগের সমস্যাকে অভিন্ন করে দেখিয়েছেন । ত্রয়ী কাব্যকে আমরা উদ্দেশ্যমূলক বলব । কবির এই কাব্য লেখার পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে।

এক।—এই কাব্যের দ্বারা নবীনচন্দ্র সেন তাঁর হৃদয়ের ভক্তিভাবকে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রথম ভক্তিভাব জাগে পুরীতে। 'আমার জীবন'-এ কবি লিখেছেন;—"সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। উৎসবে অসংখ্য যাত্রীর ভক্তির প্রবাহে আমার পাষাণ হৃদয় কৃষ্ণ ভক্তিতে আর্দ্র হইল।"(৮০) এবং ত্রয়ী কাব্য সৃষ্টির বিষয়ে বলেন;— " আমি এই আত্মহারা ভাবে কি এক অচিন্তনীয় আবেগের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি রূপে খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কাব্যাকারে দেখাইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিন খানি কাব্যে প্রস্তাবনা লিখিলাম —'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও প্রভাস।" (৮১) 'প্রভাস'-এর শেষে নবীনচন্দ্র গীতিকবির মত মনের কথাটি প্রকাশ করেন। কবির ভাষায় ;—

" চতুর্দ্দশ বর্ষ মা গো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে ,
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা , এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে ।
পাইয়াছি শোকে শান্তি ; পাইয়াছি দুঃখ সুখ ।
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র ; প্রেমে ভরিয়াছে বুক ।"(৮২)

—এ যেন গীতিকবির হৃদয়ের ঝংকার ।

দুই। কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাভারতের সমস্যাকে সমকালের সমস্যার সঙ্গে অভিন্ন করে বাঙালীর আত্মবিকাশের ধারাকে গতিদান। আমরা ত্রয়ী কাব্যে দেখব শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম , সমাজ , রাজনীতির সংস্কার করেছেন। ধর্মের নামে অনাচার ও সামাজিক রীতি আচারের নামে ব্যভিচারকে অস্বীকার করা হয়েছে। ইন্দ্রপূজা বা সূর্য পূজা কিংবা যাগযজ্ঞের চাইতে মানবসেবা কিংবা জীবসেবাকে বড় করে দেখা হয়েছে। উনিশ শতকের ধর্ম সংস্কারকের মতো শ্রীকৃষ্ণ মানবের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন;—

" মানব! চেতনাযুক্ত , বিবেকী , স্বাধীন ,
জড় ওই সূর্য্য হ'তে কত শ্রেষ্ঠতর!" (৮৩)

— সূর্যপূজার মতো বিষয়গুলো যে অবাঞ্ছিত তা শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন । তিনি বলেন, মানুষের উচিত এই বিশ্ব চরাচরের একমাত্র অধীশ্বরকে উপাসনা করা । সাধারণ পূজা অর্চনা বা যাগযজ্ঞকে ধর্ম বলে মনে করার কোন ভিত্তি নেই। কৃষ্ণের ভাষায়;—

" নহে পূর্ণ ধর্ম্ম , যদি না হয় নিষ্কাম ;
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম্ম-জ্ঞানের সোপান।" (৮৪)

ধর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে, নিঃস্বার্থভাবে সর্বভূতে হিত করা । কেননা, ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ বলেন —

" বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা ,
পঞ্চভূতে অধিষ্ঠিতা ,
পঞ্চভূতময় সৃষ্টি,— সর্ব্বত্র সমান
দেখ মহাশক্তিরূপে বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।
পার্থ! সর্ব্ব-ভূত-হিত
যাহাতে হয় সাধিত,
নিষ্কাম সে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ; পূণ্যফল তার
হয় সর্ব্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার । " (৮৫)

—কামনা বাসনা রহিত করে সমস্ত জীব জগতের মঙ্গল করে যাওয়াই ধর্ম। — এ ধর্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের 'গীতোক্ত' বাণী— যা কবি প্রচার করেছেন। জাতিভেদ প্রথাকে শ্রীকৃষ্ণ মানেন নি । তিনি বর্ণবৈষম্যের অবসান চেয়েছিলেন । অর্জুনকে বলেন;—

" দেখ ধনঞ্জয়!
ব্রাহ্মণের অত্যাচার । কথায় কথায়
অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ ।
শার্দ্দূল যেমন ভাবে, প্রাণী মাত্র সব
সৃজিত তাহার ভক্ষ্য ; তেমনি ইহারা
ভাবে — অন্য তিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের । " (৮৬)

—ক্ষত্রিয় , বৈশ্য ও শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা কৃষ্ণ বলেছেন; যা সুস্থ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। তিনি চেয়েছেন জাতির সংমিশ্রণ। সেজন্য অনার্য সম্প্রদায়—উচ্ছৃঙ্খল যাদবদের আক্রমণ করলে বা যাদব-রমণী হরণ করলে কৃষ্ণ বাধা দেন নি । কেননা তিনি বলেন —

" নহে যাদবের , আমি মানবের স্বামী!" (৮৭)

শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছৃঙ্খল যাদবদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। 'যাদবী' হরণে আর্য-অনার্যের রক্তের মিলন হোক এও তাঁর বাসনা। ব্যাসদেব বলেন;—

"গাণ্ডীবীর পরাভব, যাদবী হরণ,—
সকলই তাঁহার লীলা! ...
যাদবী হরণে আশু হইয়া মিশ্রিত
রক্ত আর্য্য অনার্য্যের, ব্যাপিয়া ভারত
কিছুদিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত
ধর্ম্মরাজ্য—ছায়াতলে! আলোকি জগৎ
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর
শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া!
শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর
সাহিত্যের, সঙ্গীতের, উঠিবে গাইয়া।
আর্য্য অনার্য্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি, কত সাম্রাজ্য মহান্
করিবে সৃজন পার্থ!" (৮৮)

নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এ অনার্যের যাদব আক্রমণ ও যাদবী হরণ যেন আর্য-অনার্যের সংস্কৃতির মিলনকেই বাস্তবায়িত করার ইঙ্গিত দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এটাই অভিপ্রেত, কেননা জাতিগত ভেদাভেদ তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত।

রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ভিন্ন ভারতের মুক্তি নেই। কৃষ্ণ সেজন্যই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে আগ্রহী। তাঁর ভাষায়;—

"যত দিন খণ্ড রাজ্য
রহিবে ভারতে, আর্য্য—
জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ—রহিবে নিশ্চয়,
রহিবে সমাজ-ভেদে ধর্ম্ম ভেদময়।
ফল ফুল ভিন্ন যথা,
তরু ভিন্ন হবে তথা,
প্রকৃতির এই নীতি; ক্ষুদ্র ভিন্নতায়
করে ধর্ম্ম-বিভিন্নতা যথায় তথায়।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি,

একমাত্র রাজনীতি,

একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত,

জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।

ততদিন হিংসানল,

হায়! এই হলাহল,

নিবিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত;" (৮৯)

—রাষ্ট্রীয় ঐক্য জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। নইলে মুক্তি অসম্ভব । এখানে শ্রীকৃষ্ণ জাতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা সৃষ্টির জন্য সক্রিয়। কিন্তু জাতিগত বৈষম্য হীনতা, ধর্মীয় বিশুদ্ধ মত ও পথ ও রাজনৈতিক একতার জন্য প্রয়োজন 'ধর্মযুদ্ধ'। যুদ্ধ মানেই তো রক্ত ঝরানোর কাজ । অর্জুন নরহত্যার মতো নৃশংস কাজে সম্মতি দিতে চান নি। তিনি বলেন;—

" ধর্ম্ম তবে বলি কারে ?

নরহত্যা ধর্ম্ম ? (৯০)

—এর উত্তরে কৃষ্ণ বলেন ; -

" সমর সর্ব্বত্র পাপ নহে , ধনঞ্জয়!

রক্ষিতে দশের ধর্ম্ম,

নহে পার্থ , পাপ কর্ম্ম

একের বিনাশ। পার্থ! নিষ্কাম সমর,—

নাহি ততোধিক আর পূণ্য শ্রেষ্ঠতর । " (৯১)

—মহৎ উদ্দেশ্যে রক্ত ঝরালে পাপ হয় না। বরং স্বার্থশূন্য মন নিয়ে দশের সুখের পথে প্রতিবন্ধক ব্যক্তিকে হত্যা করায় পূণ্য আছে ।

কবি নবীনচন্দ্র সেন সমসাময়িক কালের দেশবাসীকে মহৎ আদর্শে দীক্ষিত করার জন্য একম একটি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন। 'আমার জীবন'-এ তিনি সেই উদ্দেশ্যের কথাই শুনিয়েছেন। তাঁর ভাষায়;— "অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভ গবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম মাহাভারত।"(৯২) কবি উনিশ শতকের দেশবাসীকে মহাভারতের আদর্শ অনুসরণ করতে বলেন। 'আমার জীবন'-এ বলেন ; — " বুঝিলাম , তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে

ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না। বুঝিলাম, তিনি এবং তাঁহার শ্রীমুখের গীতোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আশা নাই।"[৯৩] কবি স্পষ্টতই শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করার কথা বলেন। সমাজ, ধর্ম, জাতি, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা উনিশ শতকের অবক্ষয়িত সমাজ ও ধর্মে, জাতিগত বৈষম্যে এবং রাষ্ট্রীয় খণ্ডতার প্রতিকারে বিশল্যকরণীর মত কাজ দেবে।এছাড়া জাতির মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। উনিশ শতকের শেষে জাতীয় জীবনের জাগরণের সময়ে এই কাব্যটি বাঙালীর আত্মবিকাশের প্রেরণায় ঐতিহাসিক সাক্ষী।

এই অধ্যায়ের মূল আলচনায় প্রবেশের প্রথমেই আমরা বলেছি, মাতৃভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য ও সমকালের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পটভূমিকে আরো গতিদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণার জন্য আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও সর্বাগ্রে বলতে হয়, উনিশ শতকে মাতৃভাষায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার আগ্রহ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উদ্বোধনের গোড়ার কথা হল—ইংরেজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো।

আখ্যান কাব্যধারার প্রথম কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার বাসনা নিয়েই কলম ধরেছেন। কেননা, ১৮৫২ সালে বেথুন সোসাইটিতে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যে অপবাদ শুনতে হয়েছিল, তাতে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নেন দুভাবে — 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লিখে সাময়িক বিরোধিতা করে এবং বাংলা সাহিত্যের অনুৎকর্ষতা মোচনের জন্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর মতো একাধিক কাব্য রচনার দ্বারা। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যা রসগত ও প্রকরণগত দিক থেকে অভিনব। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো বাংলা সাহিত্যের মানোন্নয়নের জন্য কলম ধরেছিলেন। আর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রকরণ আখ্যান কাব্যে জাতীয় দুরবস্থার চিত্র ও তা থেকে সমাধান লাভের পথ নির্দেশ করেন।

আমাদের মনে হযেছে, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পাশাপাশি রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনার বিষয়বস্তুতে সংযোজিত হয়েছে দেশীয় ভাবনা, পরাধীনতার গ্লানি, জাতীয়তাবোধ প্রকাশের সহায়ক ব্যক্তি চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী। তাই কখনো পুরাণ, কখনো প্রাচীন মহাকাব্য, কখনো ইতহাস থেকে দেশানুগত্যের সাক্ষ্যবাহী সব চরিত্র তুলে এনে পাঠককে সচেতন করে তোলার প্রয়াস দেখা যায়। যাকে আমরা দেশের মানব সম্পদ সৃষ্টির মহৎ উদ্যোগ বলে অভিহিত করতে পারি। কেননা, উনিশ শতকের আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যগুলি সমকালের আত্মবিস্মৃত পাঠকের মনে পরাধীনতার অনুভূতি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১। আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম পর্ব (শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, দশম মুদ্রণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, পৃ: ৫-৭।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬-৭।

৩। প্রথম সর্গ, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯১, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩৫।

৪। ভূমিকা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৪০।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪০।

৬। বিজ্ঞাপন, কুমারসম্ভব, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৩১১।

৭। ভূমিকা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৩৭।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮।

৯। পদ্মিনী উপাখ্যান, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৪২।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৩।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৩।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৯।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪-১৬৫।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

১৬। ভূমিকা, কর্ম্মদেবী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৭৪।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪।

১৮। কর্ম্মদেবী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৭৭।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮১।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮১।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮১।

২৪। শূরসুন্দরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২১৪।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৬।

২৬। ভূমিকা, কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৪১।

২৭। কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২৭৭।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৮।

২৯। ভূমিকা, কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২৪৪।

৩০। কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২৫০।

৩১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩, প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ২০৩।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬।

৩৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৭৩।

৩৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১১৫।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

৩৬। মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৩৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১৮০।

৩৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৭৩।

৩৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১৮৩।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

৪১। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১০।

৪২। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩৫।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

৪৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ৩৪৫।

৪৫। ভূমিকা, বৃত্রসংহার কাব্য, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক — শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৶৹

৪৬। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৪০।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

৪৯। LETTERS, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৫২৪।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩৫।

৫১। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৮৮।

৫২। বিজ্ঞাপন, বীরবাহু, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৩।

৫৩। বীরবাহু, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৭২।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬।

৫৫। ভূমিকা, বৃত্রসংহার কাব্য হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৵৹

৫৬। আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম পর্ব (শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, দশম মুদ্রণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, পৃ: ১৭০-১৭১।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪-১৬৫।

৫৮। বৃত্রসংহার কাব্য ১ম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৬৬।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

৬৪। বৃত্রসংহারকাব্য — ২য় খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ১৪০-১৪১।

৬৫। চিন্তাতরঙ্গিনী, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক — শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৮।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

৬৭। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, আশাকানন, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, খিদিরপুর , ১লা মে ১৮৭৬ , সম্পাদক —সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ২।

৬৮। ভূমিকা, আশাকানন, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, খিদিরপুর , ১লা মে ১৮৭৬ , সম্পাদক — সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ:

৬৯। আশাকানন, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, খিদিরপুর, ১লা মে ১৮৭৬, সম্পাদক — সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ৫১।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩।

৭২। পলাশির যুদ্ধ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড,— নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক — সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬, পৃ: ১৯।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪-১৫।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।

৭৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬-২৭।

৭৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০।